Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 507 – 515
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমগতি : সদানন্দ যোগীন্দ্রের দৃষ্টিতে একটি দার্শনিক রূপরেখা

তপন রুইদাস
SACT, ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান
ইমেইল : ruidastapan74@gmail.com

Keyword
সচ্চিদানন্দম্, অজ্ঞান, সৎ, বস্তু, অখণ্ড, পরমগতি, স্বরূপ লক্ষণ, তটস্থ লক্ষণ, পুরুষার্থ, শ্রেয়, প্রেয়, ভেদ।

Abstract
আমার এই গবেষণা প্রবন্ধে মূল আলোচ্য বিষয় হল অদ্বৈতবৈদান্তিক সদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতী কিভাবে তাঁর অদ্বৈতভাবনায় ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবের পরম গতির প্রতি আলোকপাত করেছেন তা বিচারপূর্বক বিশ্লেষণ করা এবং ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমগতির মধ্যে কোনো প্রকার সম্বন্ধ আছে কিনা তা প্রতিপাদন করাই মূল উদ্দেশ্য। সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর অদ্বৈতভাবনায় ব্রহ্মকে নির্গুণ ও একমাত্র অস্তিত্বশীল বস্তু রূপে স্বীকার করেছেন। এই নির্গুণ ব্রহ্ম হল সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। এছাড়া তিনি এই রূপ নির্গুণ ব্রহ্মকে আত্মজ্ঞান লাভের এক উপায় হিসাবে স্বীকার করেছেন। আর পরমগতি বলতে শাস্ত্র স্বীকৃত জীবের সর্ব উৎকৃষ্ট অবস্থা, যে অবস্থায় জীবের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে, যার ফলে ব্যক্তি পরমসুখের বা নিত্যানন্দের সন্ধান পায়। সুতরাং নিত্যানন্দের প্রাপ্তিই হল জীবের পরমগতি।এই পরমগতির উপলব্ধি করাই হল জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বা পরম পুরুষার্থ। তিনি এই পরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর একমাত্র উপায়স্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মকেই নির্দেশ করেছেন। সুতরাং পরম সুখস্বরূপ পরমগতি হল জীবের লক্ষ্য ও নির্গুণ ব্রহ্ম হল ঐ লক্ষ্য সাধনের একমাত্র উপায়। তবে সাধন প্রণালীর ক্ষেত্রে শ্রবন, মনন, নিদিধ্যাসন ছাড়াও সমাধি বা যোগকে আত্ম উপলব্ধির উপায় হিসাবে স্বীকার করেছেন। প্রসঙ্গত বলা উচিৎ যে, পারমার্থিক স্তরে উন্নত হলে লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। তখন লক্ষ্য ও উপায় এক ও অভিন্ন হয়ে যায়। কারণ ব্রহ্ম স্বয়ং শুধু সৎ বা জ্ঞান স্বরূপ নয়, তিনি আনন্দ স্বরূপও। সুতরাং ব্রহ্ম ও আনন্দ অভেদ সম্পর্কে আবদ্ধ। আবার এটাও বলা যেতে পারে যে, পরমগতি ও ব্রহ্মতত্ত্ব পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ।

Discussion
ভূমিকা (Introduction) : আলোচ্য বিষয়বস্তু যেহেতু সদানন্দ যোগীন্দ্র কর্তৃক ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমগতি সুতরাং এই সার তত্ত্বের উৎস ও মূলভিত্তির আলোচনার অবকাশ আছে। ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমগতির প্রসঙ্গ মূলত ভারতীয় দর্শনের অন্যতম

মৌলিক বেদান্তদর্শনের মধ্যে নিহিত। আমরা প্রায় সকলে অবগত, বেদের চারটি অংশের অন্তর্ভুক্ত আরণ্যক ও উপনিষদরূপ জ্ঞানকাণ্ডকে ভিত্তি করে বেদান্তদর্শনের সূচনা। সাধারণভাবে, বেদান্ত বলতে বেদের অন্ত বা শেষ অর্থাৎ উপনিষদকে বোঝায়। কেননা জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নরূপ শুদ্ধ চৈতন্যের তাৎপর্যের সুস্পষ্ট ধারক উপনিষদ। এই উপনিষদকে যেহেতু শুনে শুনে মনে রাখার রীতি ছিল, তাই উপনিষদ শ্রবণস্বরূপ শ্রুতি প্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপনিষদ ছাড়াও বেদান্তদর্শনের উৎস হিসাবে স্মৃতিপ্রস্থান শ্রীমদ্ভগবত গীতা ও মহর্ষি বেদব্যাস রচিত তর্কপ্রস্থান ব্রহ্মসূত্রও স্বীকৃত। এই ব্রহ্মসূত্রই জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক নির্ণায়ক সূত্র, যার মানদণ্ড যুক্তি। বেদান্তদর্শনের বিভিন্ন ভাষ্যকার এই ব্রহ্মসূত্রের উপর বিভিন্ন ভাষ্যরচনা করার মধ্য দিয়ে নিজেদের মৌলিক বৈদান্তিক ভাবধারাকে প্রকাশ করেছেন, যথা - শঙ্করাচার্যের শারীরকভাষ্য, রামানুজাচার্যের শ্রীভাষ্য, নিম্বার্কাচার্যের বেদান্ত পারিজাত সৌরভ, মধ্বাচার্যের পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্য প্রভৃতি। তবে উপরিউক্ত ভাষ্য বা মতবাদের মধ্যে শঙ্করাচার্যের শারীরকভাষ্যের অদ্বৈতবাদ ভারতীয় দর্শনের আঙিনায় অন্যতম অনন্য ভাবনার দাবি রাখে। অদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্বকে শঙ্করাচার্য একটি শ্লোকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন-

"শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ ব্রহ্ম সত্য জগৎন্মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ"[১]

অর্থাৎ যা কোটি কোটি গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে, একটি শ্লোকের মাধ্যমে ব্যক্ত করছি- ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মস্বরূপ। সুতরাং অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মতত্ত্বই আলোচনার বিষয় বস্তু।

এই অদ্বৈতবাদের অসংখ্য সমর্থক ছিল যথা- মুণ্ডন মিশ্র, চিৎসুখ, বাচস্পতি, নৃসিংহাশ্রম প্রভৃতি। তবে তাঁদের মধ্যে সদানন্দ যোগীন্দ্র অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ অনুরাগী ছিলেন। তাঁর মূলত খ্রষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভাব হয়ে ছিল বলে অনুমিত হয়। 'বেদান্তসার', 'বেদান্তসিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ' ও 'শঙ্করবিজয়' নামে প্রভৃতি খ্যাতিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে 'বেদান্তসার' গ্রন্থটি পণ্ডিত মহলে অতি সমাদর পেয়েছিল। যা অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের একটি উৎকৃষ্ট প্রকরণ গ্রন্থ। তাঁর ভাবনায় এই প্রকরণ গ্রন্থের রচনার মূল কারণ হল – মাধ্ব, রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যগণ অদ্বৈতবাদের বহুবিধ দোষ বা আপত্তির কথা উল্লেখ করেন। আর এই দোষ নিবারণের জন্য বাচস্পতি, চিৎসুখ, নৃসিংহ প্রভৃতি দার্শনিকেরা যত্নবান হন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এই সকল দার্শনিকের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মত পার্থক্য দেখা যায়, ফলে অদ্বৈতবাদের মূল সিদ্ধান্তগুলি সাধারণ পুরুষের নিকট অত্যন্ত দুরহ হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে সদানন্দ যোগীন্দ্র পরস্পর মতবাদের তর্ক পূর্বক অদ্বৈতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই চেষ্টার অমৃতফল হল বেদান্তসার। এই গ্রন্থের প্রথমে তিনি ব্রহ্মকে একমাত্র তত্ত্ব বলে স্বীকার করেছেন ও এই পরিদৃশ্যমান জীব ও জগতের ব্যাখার জন্য অজ্ঞান বা অবিদ্যার কথা উল্লেখ করেছেন। আর আত্মজ্ঞান লাভের জন্য তত্ত্বমসি মহাবাক্য শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন সাধনরূপে গ্রহন করলেও তিনি সমাধি বা যোগকে সেই সাধন প্রণালীর মধ্যে অন্তর্ভুক করেছেন। যার জন্যই সদানন্দকে যোগীন্দ্র বলা হয়। সুতরাং সদানন্দ যোগীন্দ্রের দর্শনে ব্রহ্মতত্ত্ব মূল বিষয়, এই তত্ত্বকে লাভ করার উপায় হল শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি বা যোগ। পরিশেষে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের ফল হল পরমানন্দ। আর একেই মুক্তি বা জীবনের পরমগতি বলা হয়।

ব্রহ্মতত্ত্ব –

আলোচ্য বিষয়বস্তু সদানন্দ যোগীন্দ্র কর্তৃক ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমগতি। স্বভাবিক ভাবে তখন প্রশ্ন হল - এই ব্রহ্মতত্ত্ব কি? এই তত্ত্বকে কিভাবে জানা সম্ভব? এই ব্রহ্মের লক্ষণ কি? সাধারণ ভাবে ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'ব্রহ্ম' শব্দটি 'বৃহ' ধাতুর উত্তর মন প্রত্যয় যুক্ত করে ব্রহ্ম শব্দের উৎপত্তি। 'বৃহ' শব্দের অর্থ বৃহৎ অর্থাৎ যা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সত্তা তা হল ব্রহ্ম। পারিভাষিক অর্থে ব্রহ্ম হল প্রকৃত সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। আর লক্ষণ দুই প্রকার, স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন হয় ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ কি? আর ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণই বা কি? বেদান্তদর্শনে তটস্থ লক্ষণে বলা হয়েছে - "যাবল্লক্ষ্যকালমনবস্থিততে সতি ব্যবর্ত্তকত্বম"[২] অর্থাৎ যা বস্তুর স্বরূপের অন্তর্গত না হয়ে লক্ষ্য বস্তুকে লক্ষ্যভিন্ন বস্তু থেকে পৃথক করে তাই হল তটস্থ লক্ষণ। আর স্বরূপ লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"যাবল্লক্ষ্যকালমবস্থিততে সতি ব্যবর্ত্তকত্বম"[৩] অর্থাৎ যা বস্তুর স্বরূপের অন্তর্গত হয়ে লক্ষ্য বস্তুকে লক্ষ্যভিন্ন বস্তু থেকে পৃথক করে তাই হল স্বরূপ লক্ষণ। সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর 'বেদান্তসার' গ্রন্থে পরমাত্মার নমস্কার পূর্বক যে মঙ্গলাচরণ করেছেন, উক্ত মঙ্গলাচরণে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ বা লক্ষণ সূচিত হয়েছে। মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি হল –

"অখণ্ডং সচ্চিদানন্দমবাঙমনসগোচরম।
আত্মানমখিলাধারমাশ্রয়েহভীষ্ট সিদ্ধয়ে।"[৪]

তিনি এখানে ব্রহ্মকে অখণ্ড, সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ, বাক ও মনের অবিষয় রূপে স্বীকার করেছেন। এছাড়াও তিনি ব্রহ্মকে এই অখিল জগতের আধার বা আশ্রয় রূপে প্রতিপাদিত করেছেন। 'অখণ্ড' শব্দের অর্থ ভেদরহিত অর্থাৎ যাতে ভেদের ত্রৈকালিক অভাব আছে। ভেদ বলতে বেদান্তদর্শনে তিন প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয়েছে যথা- সজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ ও স্বগতভেদ। সজাতীয় ভেদ বলতে বোঝায় দুটি সম জাতীয় বস্তুর মধ্যে যে ভেদ তাই হল সজাতীয় ভেদ। যেমন - একটি আম্রবৃক্ষের সাথে অপর একটি আম্রবৃক্ষের যে ভেদ তাকেই সজাতীয় ভেদ বলে। বিজাতীয় ভেদ বলতে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে যে ভেদ তাই হল বিজাতীয় ভেদ। যেমন - একটি মানুষের সাথে একটি বৃক্ষের যে ভেদ তাকেই বিজাতীয় ভেদ বলে। এছাড়া স্বগত ভেদ বলতে একটি মানুষের তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে ভেদ তাই স্বগতভেদ। ব্রহ্মের যেহেতু এই তিন প্রকার ভেদ নেই, তাই ব্রহ্মকে অখণ্ড রূপে স্বীকার করা হয়েছে। ব্রহ্ম যে ভেদ রহিত, এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণও আছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে - "তদেতদ্ ব্রহ্ম অপূর্বম্ অনপরম্ অনন্তরম অবাহ্যম্"[৫] অর্থাৎ এখানে 'অনন্তর' পদের দ্বারা ব্রহ্ম স্বগতভেদ বিহীন এবং 'অবাহ্য' পদের দ্বারা ব্রহ্ম সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদবিহীন তা স্বীকৃত হয়েছে। এছাড়া ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে- "একমেবাদ্বিতীয়ম্"[৬] অর্থাৎ এখানে 'এক' পদের দ্বারা সজাতীয়, 'এব' পদের দ্বারা স্বগত ও 'অদ্বিতীয়' পদের দ্বারা বিজাতীয় প্রভৃতি ভেদ রহিত ব্রহ্মকে বোঝান হয়েছে।

তিনি ব্রহ্মকে 'সচ্চিদানন্দম্' বলেছেন। কারণ শুধু ব্রহ্মকে অখণ্ড বললে তাকে ভাবরূপে জানা যায় না। কেননা ঐ অখণ্ড বৌদ্ধদর্শন কর্তৃক শূন্যস্বরূপও হতে পারে ফলে কোন মোক্ষকামী ব্যক্তির মুক্তির ইচ্ছা হতে পারে না। তাই ব্রহ্মকে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলা হয়েছে। 'সৎ' বলতে যা ত্রিকাল অবাধিত অর্থাৎ যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে একই থাকে। আবার সৎ বলতে যা একমাত্র অস্তিত্বশীল। সুতরাং যেহেতু ব্রহ্মই একমাত্র অস্তিত্বশীল ও ত্রিকাল অবাধিত তাই ব্রহ্মকে সৎ বলা হয়েছে। অদ্বৈতবেদান্তে দর্শনে 'সৎ' শব্দে তিন প্রকার সত্তা স্বীকৃত। যথা - প্রাতিভাসিক সৎ, ব্যবহারিক সৎ ও পারমার্থিক সৎ। ভ্রমজ্ঞানের বিষয় হল প্রাতিভাসিক সৎ এবং এই রূপ সত্তা ব্যবহারিক সত্তার দ্বারা বাধিত হয়। যেমন- দড়িকে সাপ বলে মনে করা- এটি একটি ভ্রমজ্ঞান। এই রূপ ভ্রমজ্ঞান দূরীভূত হয় ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারা। সেই ব্যবহারিক জ্ঞানটি হল প্রত্যক্ষের দ্বারা দড়ির যথার্থ জ্ঞান। অর্থাৎ দড়ির যথার্থ রূপ ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারা সর্পরূপ ভ্রমজ্ঞান বা প্রাতিভাসিক সত্তা দূরীভূত হয়। আর যে সত্তা পারমার্থিক সত্তার দ্বারা বাধিত হয়, সেই সত্তা ব্যবহারিক সৎ। ব্যবহারিক জগতের সমস্ত প্রকার জ্ঞান হল ব্যবহারিক সৎ যেমন- ঘট, পটাদির জ্ঞান। এবং যে সত্তা কোন প্রকার সত্তার দ্বারা বাধিত হয় না, ত্রিকাল অবাধিত সেই সত্তাই হল পারমার্থিক সৎ। সুতরাং ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সৎ কারণ তা ত্রিকাল অবাধিত। 'চিৎ' বলতে চৈতন্যকে বোঝান হয়েছে অর্থাৎ ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ। যদিও ন্যায়দর্শনে চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলে স্বীকার করা হয়েছে। অদ্বৈতবেদান্তে চৈতন্যকে আত্মার গুণ নয়, বরং আত্মার স্বরূপ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্য। এই চিৎ হল সমগ্র জগতের প্রকাশক এবং নিজে স্বয়ং প্রকাশক। এই বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে - "বিজ্ঞানঘনঃ এব"[৭] অর্থাৎ তিনি নিশ্চয় বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। এছাড়া কিছু অদ্বৈতবেদান্তী "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম"[৮] এই রূপ শ্রুতি উল্লেখ করে বলেন সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত আত্মার গুণ নয়, তা আত্মার স্বরূপ। সত্য, গুণ ও অনন্তকে গুণ বলা যায় না কারণ তা নিত্য ধর্ম, আর যা নিত্য ধর্ম, ধর্মী থেকে তার প্রভেদ প্রমাণসিদ্ধ নয়। 'আনন্দ' বলতে বলা হয়েছে- ব্রহ্ম হল আনন্দস্বরূপ। ব্যবহারিক জীবনে আমরা যে আনন্দ ভোগ করি তা হল অনিত্য, ফলে সেই আনন্দ চিরস্থায়ী নয়, ক্ষণস্থায়ী। ব্রহ্মলাভ জনিত যে আনন্দ তা হল নিত্য, ফলে তা চিরকাল স্থায়ী। এই রূপ আনন্দে দুঃখের লেশমাত্র থাকে না। এ

বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণের উল্লেখ আছে- "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ"[৯] অর্থাৎ যিনি আত্মজ্ঞ হন তিনি সমস্ত প্রকার শোক থেকে মুক্ত হন। সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন- জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ শুদ্ধ চৈতন্যের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় ও নিত্যানন্দের প্রাপ্তি হয়। আর ব্রহ্ম যে আনন্দস্বরূপ এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণও আছে- "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"[১০], "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"[১১]। এছাড়া শ্রুতিতে আরও বলা হয়েছে - "আনন্দং ব্রাহ্মণো বিদ্বান, ন বিভেতি কুতশ্চন"[১২] অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধী আনন্দকে যিনি জানেন, তিনি সকল প্রকার ভয় থেকে মুক্ত হন। এখানে আসলে ব্রহ্মকে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলার মধ্য দিয়ে বিধিমুখে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণকে নির্দেশ করা হয়েছে।

'অখিলাধারম' শব্দের দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন, ব্রহ্ম হল এই জগতের আধার বা আশ্রয়স্বরূপ। এছাড়া তিনি ব্রহ্মকে এই জগতের একই সঙ্গে উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলেছেন। এই বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে- "জন্মাদাস্য যতঃ"[১৩] অর্থাৎ ব্রহ্ম হল এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, স্থিতিকর্তা ও লয়কর্তা। আবার শ্রুতিতে বলা হয়েছে- যার থেকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়, তিনিই হলেন ব্রহ্ম। তবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন, এখানে যে ব্রহ্মের কথা বলা হচ্ছে তা হল স্বগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম নয়। এই অখিলাধারম্ স্বগুণ ব্রহ্মই হল ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ।

এছাড়া তিনি ব্রহ্মকে বাক ও মনের অবিষয় বলেছেন। আসলে এর অর্থ হল বাক ও মনের দ্বারা ব্রহ্ম বা আত্মাকে স্পর্শ করা যায় না। অনেক অদ্বৈতবৈদান্তিক বলেন, বাক্যের অগোচর বলার তাৎপর্য ব্রহ্ম অভিধাবৃত্তির দ্বারা বাক্যে বোধ্য নয়। কেননা বেদান্ত মতে, শব্দের অভিধা বিভিন্ন উপাধি বিশিষ্ট আত্মাতেই হতে পারে, শুদ্ধ আত্মাতে নয়। আবার মনের অগোচর বলতে বুঝতে হবে মলিন মনের দ্বারা আত্মা বা ব্রহ্ম বোধ্য নয়। কারণ মলিন মন হল পাপাত্মিকা বৃত্তি, ঐ বৃত্তিতে মন সংসার মুখী হয়, শুদ্ধ আত্মামুখী হয় না।

এছাড়া আরও একটি যুক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে, বাকের অগোচর বলার অর্থ – শব্দের দ্বারা যে জ্ঞান হয় তা হল পরোক্ষ জ্ঞান। আর শ্রুতিতে বলা হয়েছে- ব্রহ্ম বা আত্মা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়। সুতরাং ব্রহ্ম কখন পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। তাই ব্রহ্মকে বাক ও মনের অগোচর বলা হয়েছে। এখানে ব্রহ্মকে বাক ও মনের অবিষয় বলার মধ্য দিয়ে আসলে নিষেধমুখে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গগত উল্লেখ্যযোগ্য যে, সদানন্দ যোগীন্দ্র, তিনি ব্রহ্ম সম্পর্কে 'বেদান্তসার' গ্রন্থে আরও বলেছেন- "বস্তু সচ্চিদানন্দম্ অদ্বয়ং ব্রহ্ম; অজ্ঞানাদি সকল জড়সমূহ অবস্তু"[১৪] অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ অদ্বয় ব্রহ্মকে একমাত্র বস্তু বলেছেন। ব্রহ্ম ভিন্ন অজ্ঞান ও অজ্ঞানাদি সকল জড় সমূহকে অবস্তু বলেছেন। এখানে 'বস্তু' বলতে সাধারণ কোন ব্যবহারিক বিষয়কে বোঝান হয়নি। বস্তু শব্দটিকে পারমার্থিক সত্তার বোধক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যা একমাত্র নিত্য, যা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়। বেদান্তে দর্শনে যেহেতু ব্রহ্মকেই পারমার্থিক সৎ বলে স্বীকার করা হয়েছে, তাই তিনি বস্তু বলতে একমাত্র ব্রহ্মকে নির্দেশ করেছেন।

পরমগতি –

সাধারণভাবে, পরমগতি বলতে জীবনের অন্তিম বা শেষ গতিকে বোঝানো হয়। হয় মানুষ স্বর্গে গমন করবে না হলে তার বিপরীত ধামে অর্থাৎ নরকে গমন করবে। এখন, মানুষ কোন ধামে গমন করবে তা নির্ভর করবে ব্যক্তির কর্মের উপর। পাপ কর্মে লিপ্ত হলে ব্যক্তি নরকে গমন করবে, যা শুধু দুঃখের নামান্তর। আর পুণ্য কর্ম লিপ্ত হলে ব্যক্তি স্বর্গকে গমন করবে, যা আনন্দলোক হিসাবে পরিচিত। সুতরাং সাধারণ মত অনুযায়ী, পরমগতি বলতে আনন্দলোক বা দুঃখলোককে বোঝানো হয়।কিন্তু বেদান্তদর্শনে পরমগতি অর্থ আমাদের অনেকটা গভীরে নিয়ে যায়। বিশেষ করে, অদ্বৈতবেদান্তে পরমগতি বলতে, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশকে বোঝানো হয়েছে। এই পরিপূর্ণ বিকাশ যেমন দেহধারন অবস্থায় হতে পারে, ঠিক তেমনি দেহ বিনাশের পরও হতে পারে। যাকে মুক্তি বলা হয়। এই মুক্তি বলতে পরমানন্দ বা নিত্যানন্দের প্রাপ্তিকে বোঝানো হয়েছে। যা নিত্য, সুতরাং তা অবিনাশী। যেখানে দুঃখের পরিসামাপ্তি। শ্রুতিতে বলা হয়েছে - যিনি আত্মজ্ঞ হন তিনি সমস্ত প্রকার শোক-দুঃখ থেকে মুক্তি পান। সুতরাং পরমগতি বলতে পরমানন্দের প্রাপ্তিকে বোঝানো হয়েছে। তবে প্রসঙ্গগত বলা প্রয়োজন যে, এই পরম সুখকে বা নিত্যানন্দের প্রাপ্তিকে জীবনের নতুন ভাবে উৎপন্ন কোন কিছু নয়। কারণ তা ব্যক্তিরই নিজের স্বরূপ। অবিদ্যার দ্বারা ব্যক্তি নিজের স্বরূপ বুঝতে পারে শুধু।

যখনই অবিদ্যার বিনাশ হয় তখনই জীব নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। যেমন- একজন স্ত্রী নিজের গলায় স্বর্ণ অলংকার পরে থাকা সত্ত্বেও বার বার অন্যমনস্ক বশত অনেক সময় বলে যে, আমার গলার স্বর্ণ অলংকার কোথায় গেল? ঠিক কিছুক্ষণ সারা বাড়ি খোঁজার পর বলে উঠে, এই তো আমার স্বর্ণ অলংকার আমার গলাতেই আছে, আর আমি সারা বাড়ি খুঁজে বেরাচ্ছি। এই যে খুঁজে পাওয়া তা কিন্তু নতুন করে কোন কিছু পাওয়া নয়, স্বর্ণ অলংকারটা তার গলাতেই ছিল কিন্তু অন্যমনস্ক বশত বুঝতে পারেননি যে তাঁর স্বর্ণ অলংকার তাঁর কাছে নেই, হারিয়ে ফেলেছে। একেই বলে প্রাপ্তের প্রাপ্তি। ঠিক অনুরূপভাবে, জীব অবিদ্যার জন্য নিজের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে না যে, সে ব্রহ্মস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ। যখনই অবিদ্যার বিনাশ ঘটে, জীব তাঁর নিজের স্বরূপ বুঝতে পারে যে, সে আনন্দস্বরূপ। আর এই রূপ আনন্দপ্রাপ্তিকে বলা হয় প্রাপ্তের প্রাপ্তির। সুতরাং এই প্রাপ্তের প্রাপ্তিই হল পরমগতি। উপনিষদ বলছে - সমস্ত প্রকার সুখ তা জাগতিক সুখ হোক বা স্বর্গীয় সুখ হোক কিংবা পরম নিত্যানন্দ সুখ হোক সকল প্রকার সুখ আকাঙ্ক্ষারূপে মানুষের মধ্যে থাকে। কিন্তু যারা বিবেকী বিচারশীল ব্যক্তি তারা জাগতিক স্বর্গীয় সুখকে অনিত্য রূপে বিচার করে নিত্যসুখকে গ্রহণ করেন এবং তাতে মন নিবেশ করেন। যেমন কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে - শ্রেয় ও প্রেয়র কথা। শ্রেয় হল পরম কল্যাণ যা অবিদ্যা থেকে পৃথক আর প্রেয় হল যা আপাত সুখকর, যা ব্রহ্মবিদ্যা থেকে পৃথক। উভয়ই মানুষের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা রূপে আছে, কিন্তু ধীর ব্যক্তি বিচারপূর্বক প্রেয়কে অনিত্য সুখস্বরূপ বলে পরিত্যাগ করেন এবং নিত্য সুখস্বরূপ শ্রেয়কে গ্রহণ করেন। যেমন বলা হয়েছে- "শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত স্তৌ সাম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।"[১৫] কঠোপনিষদে পরমগতি ধারনায় বলা হয়েছে-

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বু দ্ধেরাত্মা মহান পরঃ।।"
"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।।"[১৬]

অর্থাৎ যমরাজ আত্মতত্ত্বের প্রশংসা করে বলছেন- ইন্দ্রের থেকে বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয়ের থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মনের থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির থেকে মহৎ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ শ্রেষ্ঠ, হিরণ্যগর্ভ থেকে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, আর অব্যক্তের থেকে শ্রেষ্ঠ হল পুরুষ। এই পুরুষের থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, তিনিই হলেন পরমগতি। সুতরাং সেই পরমগতি হল মানুষের পরমকাম্য বা অভীষ্ট।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে - এই পরমগতি লাভের উপায় কি? উপনিষদে এই চিরন্তন সুখের উপায় হিসাবে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে স্বীকার করা হয়েছে। যেহেতু উপনিষদে জ্ঞানকে একমাত্র অজ্ঞান নিবৃত্তির উপায় বলা হয়েছে। সদানন্দও যোগীন্দ্র শঙ্করকে অনুসরণ করে বলেছেন- আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভই হল জীবের পরমগতি বা মুক্তি। তবে জ্ঞান বলতে যে কোন প্রকার জ্ঞান লাভ হলেই ব্রহ্ম বিষয়ক অজ্ঞান দূর হবে তা কিন্তু বলা হচ্ছে না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলেই একমাত্র ব্রহ্ম বিষয়ক অজ্ঞান দূর হয়। তিনি বলেছেন- জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ শুদ্ধ চৈতন্যের দ্বারা অজ্ঞানের বিনাশ হলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা নিত্যানন্দের প্রাপ্তি হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা নিত্যানন্দের প্রাপ্তি সম্ভব? তিনি শঙ্করাচার্যকে অনুসরণ করে প্রথমেই বলেছেন- এর জন্য প্রথম প্রয়োজন ব্রহ্ম বিষয়ক জিজ্ঞাসা বা বিচার। এই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার যোগ্য অধিকারী হবার কিছু শর্ত শাস্ত্রে বিহিত আছে। শর্ত হল বিধি পূর্বক বেদ – বেদাঙ্গ অধ্যয়ন দ্বারা বেদের আপাত অর্থকে বুঝতে হবে। কাম্য কর্ম ও নিষিদ্ধ কর্মকে বর্জন পূর্বক নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনার দ্বারা সকল পাপ মুক্ত হয়ে নির্মল চিত্তের অধিকারী হতে হবে। এছাড়া ব্রহ্ম নিত্য বস্তু ও ব্রহ্মভিন্ন সকল কিছু অনিত্য বস্তুর ভেদজ্ঞান, জাগতিক ও স্বর্গীয় সুখের প্রতি বৈরাগ্য এবং শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি ছয়টি গুণের বিকাশ ও যার প্রবল মুক্তির ইচ্ছা আছে তিনিই হবেন ব্রহ্মবিচারের অধিকারী। এরপর এই রূপ যোগ্য অধিকারী পুরুষ গুরুর নিকট "তত্ত্বমসি"[১৭] প্রভৃতি জীব ও ব্রহ্মের অভেদবোধক মহাবাক্য শ্রবণ করবেন। তারপর এই মহাবাক্য গুলির তাৎপর্য যে ব্রহ্মাভিন্ন আত্মা এই রূপ বিচারপূর্বক মনন করবেন এবং শেষে সেই আত্মা বিষয়ে একাগ্রচিত্তে ধ্যান বা নিদিধ্যাসন করবেন। কালক্রমে সেই ব্যক্তির জীব ও ব্রহ্মের অভেদরূপ চৈতন্যের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সদানন্দ যোগীন্দ্র অদ্বৈতভাবনার সহিত নিজের মৌলিক অন্য একটি

সাধনকে যুক্ত করেছেন। তিনি শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ছাড়াও সমাধি বা যোগকে আত্ম উপলব্ধি বা আত্ম সাক্ষাৎকারের উপায় রূপে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, আমরা দেখেছি 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য থেকে "অহং ব্রহ্মাস্মি"[১৮] এই রূপ অনুভব হয়। কিন্তু তাৎপর্য এই যে, 'তত্ত্বমসি' বাক্য শোনা মাত্র 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই অনুভব অপরোক্ষভাবে প্রতীতি হয় না। তাই তিনি বলেন, বার বার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির ফলে চৈতন্যের দৃঢ়তা আসে এবং সেই কারণের জন্যই আত্ম সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। উপনিষদে বলা আছে, শ্বেতকেতু তাঁর পিতাকে আবার ব্রহ্ম উপদেশ করতে বলেছিলেন, "ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপরতু।"[১৯] এছাড়া লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়, শ্রোতার যদি পদার্থে অজ্ঞান, সংশয় থাকে তাহলে বক্তাকে বার বার একই কথা বলতে হয়।

আমরা পূর্বে জেনেছি, আত্মজ্ঞানের হেতু হল শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি। প্রথমে শ্রবণ সাধন প্রণালী সম্বন্ধে জানব। সদানন্দ যোগীন্দ্র মতে, ছয় প্রকার লিঙ্গের দ্বারা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে বেদান্তের তাৎপর্য অবধারণ করায় হল শ্রবণ। এই ছয়টি লিঙ্গ হল উপক্রম- উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও যুক্তি বা উপপত্তি। এই ছয়টি লিঙ্গের দ্বারা জীব ও ব্রহ্ম ঐক্যরূপ শুদ্ধ চৈতন্যের তাৎপর্য নির্ধারিত হয়। প্রথম লিঙ্গ উপক্রম - উপসংহার হল কোন প্রকরণের মূল বিষয়কে প্রথমে ও শেষে উপস্থাপন করা। যেমন- ছান্দোগ্য উপনিষদে ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রকরণের মূল বিষয় অদ্বিতীয় বস্তুকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্"[২০] বলে গ্রন্থ শুরু হচ্ছে এবং পরে জল, তেজ, অন্নের সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে; এই সমস্ত কিছু আত্মা থেকে ভিন্ন নয়। এই ভাবে শেষে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা হয়েছে। দ্বিতীয় লিঙ্গ অভ্যাস হল প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়কে বারবার উপস্থাপিত করা। যেমন- ছান্দোগ্য উপনিষদে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে - উদ্দালক 'তত্ত্বমসি' বাক্যটির তাৎপর্য যাতে শ্বেতকেতু লাভ করেন সেই কারণে তাঁর অনুরোধে 'ন' বার আবৃত্তি করেন। তৃতীয় লিঙ্গ অপূর্বতা হল যা অন্য কোন প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় না, এমন তত্ত্বকে যদি কোন বাক্য বা সন্দর্ভের সাহায্যে জানা যায়, তখন সেই বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ অপূর্ব অর্থে বুঝতে হবে। চতুর্থ লিঙ্গ ফল হল প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মতত্ত্ব সাধনের প্রয়োজন। যেমন উপনিষদে বলা হয়েছে - ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে জীবের পরম পুরুষার্থ লাভ হয়, সুতরাং পরম পুরুষার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের ফল। পঞ্চম লিঙ্গ অর্থবাদ হল প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রশংসা করা। জৈমিনি মতে, "সন্দিগ্ধেষু বাক্যশেষাৎ"[২১] অর্থাৎ যে স্থলে বিধিবাক্যের অর্থ বোঝা যায় না, সন্দেহ থাকে, সেই স্থলে অর্থবাদ বাক্য থেকে অর্থ নিরুপম করা হয়। আর সর্বশেষ লিঙ্গ উপপত্তি হল প্রকরণের প্রতিপাদ্য বস্তুকে প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি তাই হল উপপত্তি। যেমন - বলা হয়েছে এক খণ্ড মাটিকে জানলে মাটির বিকার ঘট প্রভৃতি সমস্তকে জানা যায়। বিকার মাত্র নাম, একমাত্র মাটিই সত্য।

দ্বিতীয় সাধন হল মনন হল বেদান্তের অনুকুল তর্কের দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের নিরন্ত্রন চিন্তা। সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন- "বেদান্তানুগুণযুক্তিভিঃ"[২২] অর্থাৎ শ্রুতি সম্মত তর্ক অবলম্বন করে মনন করতে হবে। সুতরাং ঋষি – উপদিষ্ট ব্রহ্ম বা ধর্ম সমন্ধিত উপদেশকে বেদ ও স্মৃতির অবিরোধী তর্কের দ্বারা যিনি অনুসন্ধান করেন তিনি ধর্মের যথার্থ স্বরূপ জানতে পারেন।

তৃতীয় সাধন নিদিধ্যাসন। বুৎপত্তি গত দিক থেকে নি পূর্বক ধ্যৈ ধাতুর উত্তর সন্ ও ভাবে ল্যুট প্রত্যয় যোগে নিদিধ্যাসন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এই অর্থে, যে ধ্যানের মাঝে কোন বিচ্ছেদ নেই তাই নিদিধ্যাসন। এছাড়া বলা হয়েছে- স্থুলদেহ, বাহ্য পদার্থ থেকে শুরু করে বুদ্ধি পর্যন্ত যা কিছু জড় পদার্থ সবই আত্মার বিজাতীয়, এই আত্মার বিজাতীয় বিষয়ে চিত্তবৃত্তি ত্যাগ করে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে চিত্তবৃত্তি অবিচ্ছিন্ন রূপে প্রবাহিত করায় হল নিদিধ্যাসন। সুতরাং শ্রবণ, মনন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ শুদ্ধ চৈতন্যে ধারনাবিশিষ্ট চিত্তে যে একাকার বৃত্তি প্রবাহ তাকে নিদিধ্যাসন বলে।

সর্বশেষ প্রণালী সমাধি বা যোগ। আমরা জানি পাতঞ্জল যোগদর্শনে সমাধির প্রসঙ্গে বলা আছে। যোগদর্শনে বলা হয়েছে- "যোগঃ চিত্তবৃত্তির্নিরোধঃ"[২৩] অর্থাৎ যোগ বলতে চিত্তবৃত্তির নিরোধকে বোঝায়। এই চিত্তের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ অনুসারে বিভিন্ন স্তর আছে যথা- ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। তবে এই স্তর গুলির মধ্যে একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থাতে যোগ সম্ভব হয়। একাগ্র অবস্থায় চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় না, মন তখন কোন একটি বস্তুতে নিবিষ্ট

থাকে। আর নিরুদ্ধ অবস্থায় মনের সমস্ত বিকার নষ্ট হয়ে যায় মন তখন শান্ত ও সমাহিত হয়ে অবস্থান করে। এই অবস্থাতে অতীত ও বর্তমানের সমস্ত কর্মফলের নাশ হলেই সমাধিতে চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। এই কারণে চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য অষ্টাঙ্গিক যোগাঙ্গ অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- যথা- যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারনা, ধ্যান ও সমাধি। অন্যদিকে, সদানন্দ যোগীন্দ্র সমাধির কথা বললেও তার কোন লক্ষণ দেননি। তিনি দুপ্রকার সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক সমাধির কথার উল্লেখ করেছেন। সবিকল্পক সমাধি বলতে বোঝায় যেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান এই তিনটি বিকল্প থাকে। তবে এই সমাধিতে দ্বৈতের জ্ঞান থাকলেও দ্বৈতভাব যে মিথ্যা তা জ্ঞাতার কাছে অবভাসিত হয়। যেমন- মৃৎশিল্পী মাটির হাতি সৃষ্টি করলে তার কাছে হাতিই উপস্থিত হয় ঠিকই, তবে সেই শিল্পীর নিশ্চয় জ্ঞান থাকে যে, হাতিটি মিথ্যা। কারণ এই হাতির উপাদান যে মাটি তাই সত্য। নির্বিকল্পক সমাধি বলতে যেখানে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের যে বিভাগ বিকল্প থাকে না। এখানে চিত্তবৃত্তি পরম বস্তু ব্রহ্মে অত্যন্ত অভিন্নরূপ স্থিরতা লাভ করে। তবে তিনি নির্বিকল্পক সমাধির দুটি প্রকারের কথা বলেছেন। ১. প্রথম প্রকার সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনটি বিকল্প থাকে না ঠিকই কিন্তু এই সমাধিতে অনুভবজন্য সংস্কারের রেশ থেকে যায়, যার ফলে ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শনের পরও আবার জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রভৃতির জ্ঞান হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। ২. দ্বিতীয় প্রকার সমাধিতে জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রভৃতি বিকল্প থাকে না লয় হয়ে যায়, ফলে অনুভবজন্য সংস্কার চিরদিনের জন্য চলে যায়। এই কারণে চিত্তবৃত্তি অখণ্ড ব্রহ্মের আকারে আকরিত হয়ে অবস্থান করে। এই রূপ নির্বিকল্পক সমাধির কথাই গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেছেন- যেমন লবণ জলে মিশে গেলে, জলেরই আকার প্রাপ্ত হয়। স্বতন্ত্রভাবে লবণের জ্ঞান হয় না। ঠিক অনুরূপ ভাবে, চিত্তবৃত্তি অখণ্ড ব্রহ্ম আকারে আকরিত হলে চিত্তবৃত্তির আলাদা করে জ্ঞান হয় না। এছাড়া তিনি নির্বিকল্পক সমাধির বিভিন্ন অঙ্গের উল্লেখ করেছেন যথা - যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারনা, ধ্যান ও সমাধি। যম বলতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ প্রভৃতিকে বুঝিয়েছন। নিয়ম বলতে, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান প্রভৃতিকে বুঝিয়েছেন। আর হাত, পা প্রভৃতির বিশেষ সন্নিবেশকে বলা হয়েছে আসন। রেচক, পূরক ও কুম্ভকরূপ প্রানবায়ুর নিরোধের উপায় হল প্রাণায়াম। নিজ নিজ বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিবৃত্তি করায় হল প্রত্যাহার। অদ্বিতীয় পরম বস্তুতে অন্তঃকরণের ধারন হল ধারনা। আর অন্তঃকরণ বৃত্তির বিচ্ছিন্ন প্রবাহ হল ধ্যান এবং অঙ্গরূপ সবিকল্পকই হল সমাধি। সুতরাং নির্বিকল্পক সমাধি হল অঙ্গী আর যম, নিয়ম প্রভৃতি হল অঙ্গ। সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেন, এই অঙ্গ গুলি সঠিক ভাবে অভ্যাস করতে পারলেই নির্বিকল্পক সম্পন্ন হয়। তবে অষ্টাঙ্গ যোগের নিয়মিত অভ্যাস করলেও কখনও কখনও নির্বিকল্পক সমাধির প্রতিবন্ধকতা এসে যায় যাদের বিঘ্ন বলে স্বীকার করা হয়েছে। এই বিঘ্ন যেমন- লয়, বিক্ষেপ, কশায় ও রসাস্বাদ। লয় বলতে চিত্তবৃত্তির লয়। যখন চিত্তবৃত্তি এক অদ্বিতীয় বস্তুকে অবলম্বন না করে নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে তা হচ্ছে লয়। চিত্তবৃত্তি যখন অখণ্ড বস্তুকে অবলম্বন না করে অন্য বিষয়কে অবলম্বন করে তা হল বিক্ষেপ। যখন রাগদির দ্বারা বাসনার জন্য চিত্তের জড়তা বশতঃ অখণ্ড বস্তুকে অবলম্বন করে না তাই হল কশায়। আর নির্বিকল্পক সমাধির শুরু দিকে সবিকল্পক আনন্দের আস্বাদানই হল রসাস্বাদ। সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেন- যখন এই চার বিঘ্নের বিনাশ বা মুক্তির পরে সাধকের চিত্ত বায়ুবিরহিত স্থলে দীপ শিখার মত অচঞ্চল রূপে অখণ্ড চৈতন্যে অবস্থান করে, চিত্তের এই রূপ অখণ্ডচৈতন্যইটাই নির্বিকল্পক সমাধি। এই সমাধি অবস্থায় ব্যক্তি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যান। এটাই জীবের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। যার ফলে জীব চিরন্তন সুখের উপলব্ধি করে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। এবং একেই জীবনের পরমগতি বলা হয়। এই পরমগতিই হল মোক্ষ যা পরম পুরুষার্থ। তবে মোক্ষ দু ধরনের হয় জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি। সদানন্দ যোগীন্দ্র উভয় প্রকার মুক্তিকে স্বীকার করেছেন।

উপরিউক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমগতি আলোচনা থেকে বুঝতে পারছি যে, পরমগতি হল জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, ব্রহ্মতত্ত্ব হল সেই সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্যের উপায় সাধন। কারণ ব্রহ্মবিদ্যা হতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলেই জীবের পরমগতি হয়। সুতরাং পরমগতি হল ব্রহ্মজ্ঞানের অমৃত ফল।এখানে একটি প্রশ্ন হল যে, লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যে সম্বন্ধ বর্তমান। তাহলে ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমগতির মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয়? অদ্বৈতবেদান্তে ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমগতির সম্বন্ধ অভেদ সম্বন্ধ বা উভয়ই পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ কারণ ব্রহ্ম স্বয়ং আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম যেমন সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ

তেমনি আনন্দস্বরূপও। এই আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ, তার কোন গুণ নয়। ব্রহ্মের এই আনন্দ সম্পর্কে শ্রুতিতে বলা হয়েছে-"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।"[২৪] সুতরাং ব্রহ্ম ও আনন্দ পৃথক নয়। উভয়ই এক। সুতরাং পারমার্থিক স্তরে লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই। এই স্তরে ভেদের অবলুপ্তি ঘটে যায়। অতএব পরমগতি ও ব্রহ্মতত্ত্ব পারমার্থিক স্তরে অভেদ সম্বন্ধে আবদ্ধ।

Conclusion :

পরিশেষে বলা যায় যে, সদানন্দ যোগীন্দ্র একমাত্র ব্রহ্মকে প্রকৃত অস্তিত্বশীল বস্তু হিসাবে স্বীকার করেছেন। যা অখণ্ড, সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। ফলে তিনি একজন প্রকৃত অদ্বৈতবাদী।তবে তিনি অদ্বৈতবাদের সার অংশকে অক্ষুণ্ণ রেখে অন্যান্য অদ্বৈতবাদীদের থেকে একটু আলাদা মতও পোষণ করেছেন। তিনি শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ছাড়াও যোগ বা সমাধিকে ব্রহ্মতত্ত্বের সাধন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নির্বিকল্পক সমাধিতেই আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব হয়।যার ফলে অবিদ্যার বিনাশে জীব তাঁর স্বরূপকে জানতে পারে এবং ফল স্বরূপত জীবের পরমগতি হয়। যাকে নিত্যানন্দের প্রাপ্তি বলা হয়। সুতরাং নিত্যানন্দ হল ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অমৃত ফল। অতএব এই অমৃতফলই সমগ্র জীবের পরম পুরুষার্থ।

তথ্যসূত্র :

১. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার. 'ভারতীয় দর্শন', কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৯. পৃ. ২৮৬
২. স্বামী, বিশ্বরুপানন্দ. 'বেদান্তদর্শনম', কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৬. পৃ. ৯৭
৩. স্বামী, বিশ্বরুপানন্দ. 'বেদান্তদর্শনম', কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৬. পৃ. ৯৭
৪. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ. 'বেদান্তসার', কলকাতা, বাসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৩৯. পৃ. ৩
৫. 'বেদান্তগ্রন্থমালা উপনিষৎ'. 'গোলপার্ক', কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০১৫. পৃ. ৩৭৯
৬. ব্রহ্মচারী, মেধাচৈতন্য. 'বেদান্তসারের তিনটি টীকার বিশদ বঙ্গানুবাদ', কলকাতা, দণ্ডীস্বামী দামোদর আশ্রম, ১৪১৬. পৃ. ১১
৭. 'বেদান্তগ্রন্থমালা উপনিষৎ'. কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০১৫. পৃ. ৩৭২
৮. 'বেদান্তগ্রন্থমালা উপনিষৎ', কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০১৫. পৃ. ১১০
৯. 'বেদান্তগ্রন্থমালা উপনিষৎ', কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০১৫. পৃ. ২৯৫
১০. 'বেদগ্রন্থমালা উপনিষৎ', গোলপার্ক, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০১৫. পৃ. ৪০৭
১১. 'বেদগ্রন্থমালা উপনিষৎ', গোলপার্ক, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০১৫. পৃ. ১২০
১২. 'বেদগ্রন্থমালা্ উপনিষৎ', 'গোলপার্ক, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০১৫. পৃ. ১১২
১৩. বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী. 'বেদান্তদর্শনম', কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৯. পৃ. ৯৮
১৪. চক্রবর্তী, লোকনাথ. 'বেদান্তসার', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৪. পৃ. ৯২
১৫. ভূতেশানন্দ, স্বামী. 'কঠোপনিষদ', কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭. পৃ. ৪০
১৬. ভূতেশানন্দ, স্বামী. 'কঠোপনিষদ', কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭. পৃ. ১৪৫-১৪৬
১৭. 'বেদগ্রন্থমালা উপনিষৎ', গোলপার্ক, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০১৫. পৃ. ২৮৮

১৮. 'বেদগ্রন্থমালা উপনিষৎ', গোলপার্ক, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০১৫. পৃ. ৩৪৯
১৯. চক্রবর্তী, লোকনাথ. 'বেদান্তসার', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৪. পৃ. ২১৪
২০. চক্রবর্তী, লোকনাথ. 'বেদান্তসার', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৪. পৃ. ২১৫
২১. চক্রবর্তী, লোকনাথ. 'বেদান্তসার', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৪. পৃ. ২১৭
২২. চক্রবর্তী, লোকনাথ. 'বেদান্তসার', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৪. পৃ. ২১৯
২৩. চক্রবতী, নীরদবরণ. 'ভারতীয় দর্শন', কলকাতা, দি ঢাকা স্টুডেন্টস লাইব্রেরী, ২০১৫. পৃ. ২৭৮
২৪. পাল, বিপদভঞ্জন. 'বেদান্তসারঃ', কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২০. পৃ. ০৯